MAHALAYA SNACKS CORNER
RESTAURANT & CATERING
Free Home Delivery
P-703, Lake Town, Block - 'A', Kolkata-700 089
Phone: 033-2866 0126
M— 09433603431

সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক পত্রিকা ● ৮ পাতা

কলকাতা ২৯ পৌষ ১৪২১ ● বুধবার ১৪ জানুয়ারি ২০১৫ ● ২ টাকা

sebakpatrika@gmail.com

ROLLER SKATING
'S' for Skating and SKATING Makes the World Happy
2 days a week
West Bengal Trainer Speed & Artistic
Age Limit - 3 year & above

Disinvestment, বিলগ্নীকরণ। বিলগ্নীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় লাভজনক সরকারি সংস্থা (CPSE) দেশের পক্ষে সত্যিই ভালো হবে, না কি আখেরে কালো গহ্বরের দিকেই এগিয়ে যাবে— দ্বিমাত্রিক প্রবাহেরই একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনায়

শঙ্করলাল ঘোষাল

প্রথমেই জানাই, সরকারি সেই সমস্ত সংস্থাগুলি সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা বা না-থাকার সাথে কতটা অর্থনীতির ভারসাম্য যুক্ত বিশেষ করে এইটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলেছেও। চলবেও।

দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড অনেকটাই নির্ভর করে আছে এই সমস্ত 'রত্ন খচিত' সংস্থাগুলির ওপরই যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্পূর্ণতই নিজস্ব পরিকাঠামো। এখানেই জানাতে হচ্ছে কে বা কারা কতটা রত্ন খচিত। এবং কীভাবে।

যে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা ধারাবাহিকভাবে গত তিন বছর লাভজনক অবস্থায় থেকেছে বা থাকে তাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করেছে দেশের সরকার।

মিনিরত্ন, নবরত্ন এবং মহারত্ন।

এই 'রত্ন খচিত' সংস্থাগুলি সম্বন্ধে সামান্য পরিচয় দিতে গিয়ে বলতে হয় —

মিনিরত্ন : যে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা গত তিন বছর ধারাবাহিকভাবে লাভজনক অবস্থায় থাকে ও তাদের নীট ধনরাশি সম্পদ পজিটিভ তারা এই পর্যায়ভুক্ত। এই সমস্ত সংস্থাগুলির সংখ্যা বর্তমানে আমাদের দেশে মাত্র ৭২টি।

নবরত্ন : যে সমস্ত মিনিরত্ন সংস্থাগুলির শেয়ার বাজারে 'এ' তালিকাভুক্ত আছে এবং বিগত পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন অর্থবিদ্যা সংক্রান্ত মান নির্ধারক সূচক দ্বারা উচ্চমানভুক্ত চিহ্নিত হয়েছে তাদেরকে নবরত্ন সংস্থা বলা যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ১৭টি এই ধরনের সংস্থা বিদ্যমান।

মহারত্ন : এই জাতীয় কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলির নিম্ন উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাওয়া যায়: (১) এদের বিগত তিন বছরের বাৎসরিক গড় বিক্রয় অবশ্যই ২৫ হাজার কোটি টাকার ঊর্দ্ধে। (২) এই সংস্থাগুলি বিগত তিন বছরের বাৎসরিক গড় নীট সম্পদ মূল্য ১৫,০০০ কোটি টাকার বেশী। (৩) এই সংস্থাগুলির কর ব্যতীত গড় লাভ্যাংশের পরিমাণ বিগত তিন বছরে ৫০০০ কোটি টাকার বেশি হলে তারাই মহারত্ন পর্যায়ভুক্ত হিসেবে সরকার চিহ্নিত করে। যেমন (১) ভারত ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড, (২) ভারত পেট্রুলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড, (৩) কন্টেনার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, (৪) ইঞ্জিনিয়ার্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড, (৫) হিন্দুস্থান এরোনটিক্যালস লিমিটেড, (৬) হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড, (৭) মহানগর টেলিফোন নিগম লিমিটেড, (৮) ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড, (৯) ন্যাশানাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন লিমিটেড, (১০) এন এম ডি সি লিমিটেড, (১১) নেভেলি লিগনাইট কর্পোরেশন লিমিটেড, (১২)

এরপর ৬ পাতায়

গান্ধী সেবা সংঘের বাৎসরিক প্রতিবেদন

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের চিকিৎসাবিভাগের নিয়মিত পরিষেবা।

গৌতম সাহা (সাধারণ সম্পাদক)

৭ই ডিসেম্বর, ২০১৪-র রবিবারের সকালে, গান্ধী সেবা সঙ্ঘের ৬৬তম সাধারণ অধিবেশনে সকল সদস্যের তরফ থেকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানাই। সুদীর্ঘ প্রায় সত্তর বছরের গান্ধী সেবা সঙ্ঘের ইতিহাসে আজ অভূতপূর্ব কিছু ঘটনা ঘটতে চলেছে। আমরা সেইসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং কর্মকাণ্ডের কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি। গান্ধী সেবা সংঘের কর্মধারার সঙ্গে আপনাদের সকলের এবং জনসাধারণের সহযোগীতা আমরা সবসময় স্মরণ করি। যা কিছু খামতি তা হয়তো আমাদের নিজেদের ভুলের জন্যই।

প্রথমে জানাই আমাদের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য শ্রী অনুকূল সরকার এবং সঙ্ঘের নিয়মিত সম্মানীয় চিকিৎসক ডঃ অরুণ কুমার দাস আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এই দু'জনের আত্মার শান্তি এবং তাদের পরিবারের প্রতি ঈশ্বরের কাছে তাঁদের জন্য প্রার্থনা করি এবং পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই।

গান্ধী সেবা সংঘের কর্ম বিবরণ - সেবা সদন হাসপাতাল ঃ এতদিনে আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন যে, প্রায় ১২কোটি টাকার ৮০ বেডের একটি হাসপাতাল "গান্ধী সেবা সদন" তৈরী করার কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি। গান্ধী সেবা সংঘের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অবশ্যই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই হাসপাতাল আউটডোর, প্যাথোলজি ও সবধরণের রোগ নির্ণয়ের সুব্যবস্থা, ফার্মাসি ছাড়াও থাকবে ৩টি অপারেশন থিয়েটার, ICU, ITU, Dialysis, Specialist Clinic. সেবা সদনের প্রায় ৩৬,০০০ স্কোয়ার ফুটের নির্মাণ কার্য্য অনেকটাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে অবশ্যই সম্ভব হচ্ছে আমাদের প্রিয় বিধায়ক সুজিত বোসের নিঃস্বার্থ ও সর্বাঙ্গীন সহযোগিতার জন্য তাঁকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা আগামী ২রা অক্টোবর, ২০১৫, মহাত্মা গান্ধীর শুভ জন্মদিনে হাসপাতাল

উদ্বোধনের দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছি। যাঁরা আমাদের বিশেষভাবে সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্মে সাহায্য করছেন তাদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রী ধীমান ভট্টাচার্য্য, শ্রী জয়ন্ত সাহা, শ্রী রাজা গোপাল ভট্টাচার্য্য, শ্রী তিমির বরণ চক্রবর্তী, শ্রী ধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এছাড়া বেশ কিছু নামী চিকিৎসক এবং চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত মানুষ আমাদের সব সময় পাশে আছেন। এই মুহূর্তে আমাদের সেবা সদন প্রকল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। নানা বিষয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, সব বিভাগগুলি পরিকল্পনা মত স্থাপন করা, প্রচারের দিকে নজর দেওয়া—অনেক অনেক কাজ। আমাদের বিশেষ আবেদন সকলের কাছে প্রত্যেকটি কাজে ডাক্তার, সাধারণ মানুষ, সমাজসেবী, অনেক সমমনোভাবাপন্ন মানুষ ও কর্মীর প্রয়োজন। আসুন এবং আমাদের হাতে হাত মেলান—আমরা সবাই হাত ধরাধরি করে আমাদের নিজেদের হাসপাতাল "গান্ধী সেবা সদন" একটা আদর্শ হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তুলি।

চিকিৎসা বিভাগ ঃ দীর্ঘদিন যাবৎ সংঘ নিয়মিতভাবে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, চোখ এবং ই. সি. জি, বিভাগ চালিয়ে

এরপর ২ পাতায়

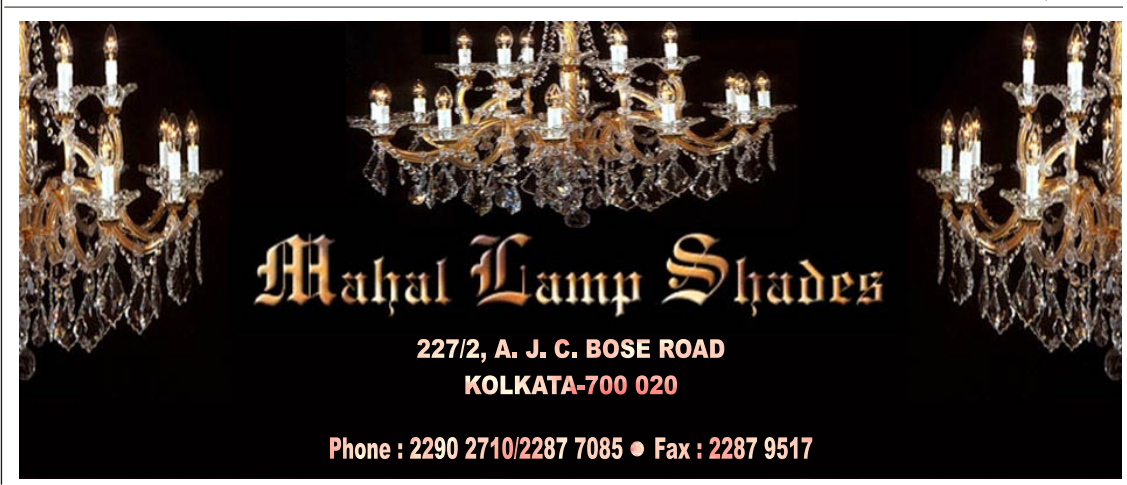

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের ইতিবৃত্ত

উৎপল ঘোষ

গত সংখ্যার শেষ ভাগ

চক্ষু বিভাগের পরিচালনায় আছেন শ্রীমতী মঞ্জু মুখার্জী, শ্রী সমীর নন্দী, ডাঃ আশীষ গাঙ্গুলী, শ্রী সুব্রত পাল।

সাংস্কৃতিক বিভাগ

সাংস্কৃতিক বিভাগের পরিচালনায় 'মাণিক্য-মঞ্চে' সংঘের নিয়মিত বার্ষিক অনুষ্ঠান-বর্ষবরণ -উৎসব, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস পালন, বিজয়া সম্মেলনী ও দীপাবলী উৎসব এবং মহাত্মা গান্ধীও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হয়।

বিগত ২০১১ সালে কবিগুরুর সার্ধশত জন্মউৎসব পালন উপলক্ষ্যে দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। রবীন্দ্র-সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন প্রয়াত কবি বাসুদেব দেব, অধ্যাপক অভ্র ঘোষ, সাহিত্যিক অমিতাভ সমাজপতি প্রমুখ। ২০১২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পালিত হয় মহা সমারোহে। ডাঃ হিরন্ময় সাহার উদ্যোগে শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে স্বামীজির জীবনী ও বাণী বিষয়ে প্রদর্শণীর আয়োজন করা হয়। সংঘ ভবনে আয়োজিত সভায় বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিগণ, ও বেসুর উপাচার্য্য ডঃ অজয় রায়, অধ্যাপক সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য্য এবং সারদা মিশনের মাতাজী প্রদীপ্ত প্রাণা সভা অলংকৃত করেন। সকল অতিথিরা স্বামীজির জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। ভক্তিমূলক সংগীতে মুখর ছিল অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন। সাংস্কতিক বিভাগের দায়িত্বে আছেন শ্রী উৎপল ঘোষ, ধনঞ্জয় আঢ্য, শ্রীমতী জবা গুহঠাকুরতা, অনিরুদ্ধ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ।

শিশুবিভাগ

শিশু বিভাগে প্রতি রবিবার সকালে শিশুদের সযত্নে অঙ্কনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গড়ে ৩০-৪০ জন শিশু অংকন প্রশিক্ষণ নেয় শিশুদের জন্য আবৃত্তি শেখানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শিশুবিভাগের দায়িত্বে আছেন শ্রীমতী জবা গুহঠাকুরতা ও শ্রী গৌতম সাহা। বছরে একবার ৩-৪দিন যাবৎ অঙ্কন / চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে এই সংঘভবনে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষন দেওয়া হয় মাসিক চুক্তির ভিত্তিতে। যেমন ক্যারাটে প্রশিক্ষন, নৃত্য প্রশিক্ষণ, রোলার স্কেটিং-এর ট্রেনিং, গিটার ও কী-বোর্ড বাজানোর প্রশিক্ষণ এবং 'ইকো' পরিচালিত অভিনয়ের মহড়া।

সেবাসদন (হাসপাতাল প্রকল্প)

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পূর্বদিকে প্রায় এক-বিঘা জমিতে সর্বসাধারণের সুলভ-চিকিৎসার জন্য একটি 'সুপার স্পেশালিটি' হাসপাতাল নির্মাণের বিশাল পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বিধায়ক শ্রী সুজিত বসুর উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় পরিকল্পিত হাসপাতালটির গান্ধী সেবা সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সৌগত রায়। উপস্থিত ছিলেন মাননীয়া সাংসদ ডাঃ কাকলী ঘোষ দস্তিদার, বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ, স্থানীয় বিধায়ক এবং সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ।

এরপর প্রাথমিক পর্য্যায়ে "সাইটপ্ল্যান', 'বিল্ডিং প্ল্যান' অনুমোদন, প্রয়োজনীয় মাটি পরীক্ষা এবং প্রারম্ভিক বাজেট প্রস্তুতি ও অর্থসংস্থানের ব্যবস্থায় 'হাসপাতাল পরিচালন সমিতির' চেয়ারম্যান শ্রী সুজিত বসুর প্রচেষ্টায় এবং জমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় 'গান্ধী সেবা সদনের' নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০১২ সালের ২রা অক্টোবর। ইতিমধ্যে নির্মাণকাজের অর্থসাহায্যের জন্য মাননীয়া সাংসদ ডঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সাংসদ তহবিলের অনুদান, বিধায়ক শ্রী সুজিত বসুর বিধায়ক তহবিলের অনুদান, শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পূজা কমিটির দান এবং বিভিন্ন সংস্থা ও সহৃদয় ব্যক্তিদের অর্থসাহায্যে ছয়তলা পর্য্যন্ত ছাদ ঢালাই-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আশা-রাখি সকলের সাহায্য ও সহযোগিতায় এবং বিশেষভাবে বিধায়ক সুজিত বসুর উদ্যোগে অচিরেই পরিকল্পিত হাসপাতাল, 'গান্ধী সেবা সদন' গড়ে উঠবে।

উপসংহার

পরিশেষে উল্লেখ করি দীর্ঘ ৬৮ বছরের এই সেবা প্রতিষ্ঠান কালস্রোতের উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। চলার পথে বহু বাধা বিঘ্ন, সংকট দেখা গেছে। কিন্তু সংকটের বিহ্বলতায় বিভ্রান্ত না হয়ে, গতিরুদ্ধ না হয়ে, 'চরৈবেতী' মন্ত্র নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলেছে সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে। পাথেয় শুধু সকলের শুভেচ্ছা, সুপরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতা।

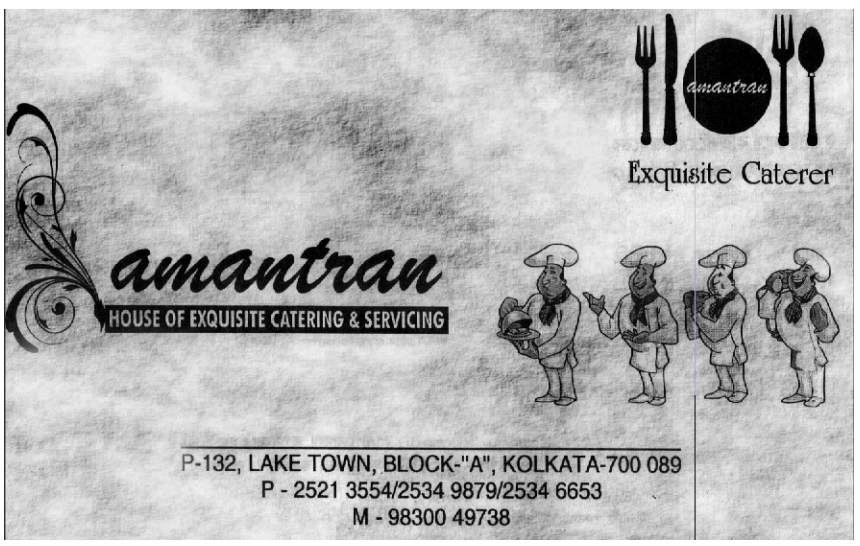

গান্ধী সেবা সংঘের বাৎসরিক প্রতিবেদন

১ পাতার পর

যাচ্ছে। চিকিৎসা বিভাগের ঘরটিকে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে মানুষের সুবিধের জন্য। এলোপ্যাথি বিভাগে মাসে প্রায় ৩২০জন রোগী, হোমিওপ্যাথিতে মাসিক ৭৫০ জন এবং চক্ষুবিভাগে প্রায় ১৪০০ রুগীকে সেবা দেওয়া হয়েছে। পূর্ব কলিকাতা নাগরিক পরিষদের তত্বাবধানে চোখের নিয়মিত অপারেশন ও চশমা দেওয়া হয়। তাদের এই নিরলস সেবা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

ডাঃ তাপস চট্টরাজের তত্বাবধানে কয়েকটি চিকিৎসা সংক্রান্ত camp সংঘ ভবনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে সন্ধ্যাকালীন "Specialist Clinic" আরম্ভ করার পরিকল্পনা আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজসেবী সংস্থা "PLANETE CUERE" , যাদের সাহায্য আমরা প্রায় কুড়ি বছর ধরে পাচ্ছি এবং চিকিৎসা বিভাগটি সুচারু রূপে চালানো সম্ভব হচ্ছে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সমস্ত ডাক্তার ও সেবাকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতাতেই এই চিকিৎসা বিভাগটি. দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে।

ক্যানসার বিভাগ (সেবা নিবাস)ঃ অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের এবং তার নিকটজনের থাকার ব্যবস্থা সেবা নিবাসে করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে, বিহার, ঝাড়খণ্ড, আন্দামান, নেপাল, বাংলাদেশ, থেকে নিয়মিত মানুষজন আসেন এখানে। সাধারণতঃ ৭৫% ঘর সবসময়ই ভর্তি থাকে। চাহিদার কথা ভেবে, আমরা তিনতলার নির্মাণকার্য্য আরম্ভ করেছি। বেশ কিছু সহৃদয় মানুষের সাহায্য আমরা পেয়েছি। আরও প্রায় ৭লাখ টাকা প্রয়োজন। সকল সেবামনস্ক মানুষের কছে আমাদের আবেদন, যে যেমন পারবেন, আমাদের সেবানিবাস নির্মাণকার্য্যে সাহায্য করবেন। গান্ধী সেবা সংঘ দীর্ঘদিন ধরে সকলের আর্থিক সাহায্যতেই এই কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে—সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

লাইব্রেরী ঃ সংঘজীবনে লাইব্রেরী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের জায়গা। প্রতিদিন সন্ধেবেলা ছোটো বড় পড়ুয়ার দল এখানে ভীড় জমায়। বই দেওয়া নেওয়া, টেবিলের ওপরে রাখা অজস্র পত্রিকা পড়া—গল্প-গুজব করা, এসবই বেশ নিয়মিত দৃশ্য। প্রতি বছর সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বই কেনার অনুদান পাওয়া যায়। বেশ কয়েকজন সহৃদয় মানুষ আর্থিকভাবে, বই দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। লাইব্রেরী থেকে আয়োজিত প্রতিবছর সংঘের সরস্বতী পূজো এবং পিকনিক সকলের কাছেই খুব আকর্ষণীয়।

মাণিক্য মঞ্চ ঃ এতদ অঞ্চলে এই 'মাণিক্য মঞ্চের' মত একটি ছোট কিন্তু সুন্দর ব্যবহারযোগ্য হলঘর বিশেষ দেখা যায় না। বহু সংস্থা যেমন EKCO সাংস্কৃতিক সংস্থা, আত্মবিকাশ সাহিত্য পত্রিকা, কালিন্দী পুনশ্চ, ভীষ্মদেব মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, নব অগ্নিবীণা, এরকম অনেকেই এখানে নিয়মিত অনুষ্ঠান করেন। এই হলটিকে আরও সুন্দর ও

সুব্যবস্থাসম্মত করা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত সুজিত বসু মহাশয়, এম. এল. এ এই ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ঃ এই প্রথম সংঘ 'সেবক' নামে একটি নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করল। প্রতি ২মাস অন্তর এটি প্রকাশিত হবে। বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটি প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যিক শ্রী সুবোধ ঘোষের ১০৬তম জন্মদিন উদ্‌যাপন, চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চারু খান মহাশয়কে সম্বর্ধনা ও সেবকের প্রথম প্রকাশ একটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী অনুষ্ঠানে সেদিন সকলে যোগ দিতে পেরেছিলেন। সাহিত্যিক শ্রী তরুন সান্যাল, শ্রী শান্তিনাথ চ্যাটার্জী, শ্রী শ্রীহীর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত চারু খান এবং বহু বিশিষ্ট অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত ছিলেন।

প্রতি বছরের মত গান্ধী জন্মজয়ন্তী, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মদিন, বিজয়া সম্মিলনী, নববর্ষ উদ্‌যাপন, স্বাধীনতা দিবস পালন আমরা ক'রে থাকি। শিশুদের বিকাশের জন্য একটি আঁকার ক্লাস প্রতি রবিবার চালানো হয়। গান্ধী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেবার জন্য প্রত্যেক ক্লাসে বৃত্তি দেওয়া হয়।

আমাদের নতুন অডিটর M/S D. Bhattacharya and Associates আমাদের Accounts দেখাশোনা করে রিপোর্ট তৈরী করেছেন। সংঘ সদস্য শ্রী রাম অবতার যোশী ও শ্রী প্রতীপ সাহাকে ধন্যবাদ জানাই এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে সুচারুরূপে পরিচলনা করার জন্যে।

পরিশেষে যাঁরা সংঘের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। যতটুকু সাফল্য আমরা পেয়েছি কিছু উদারমনস্ক মানুষের সাহায্য দ্বারাই সেটা সম্ভব হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে আমরা আরও বেশী ক'রে পেতে চাই। তাদের মধ্যে উৎসাহ দেখতে পাই কিন্তু তাদের নিজস্ব কর্মব্যস্ততার জন্য হয়তো সময় দিতে পারছে না।

সবার কাছে আমাদের বিশেষ আবেদন, কাছে-দূরের সকল উদার মনস্ব মানুষ এগিয়ে এসে এই বিশাল সেবার কাজে আমাদের হাতে হাত মেলান ও সংঘকে দীর্ঘস্থায়ী করুন।

সংঘকে মুক্তহস্তে দান করুন ও সকলকে দান করার জন্য অনুপ্রাণিত করুন

পানীয় জল, ফ্লোরাইড এবং দূষণ – কিছু বক্তব্য

ডঃ দিলীপ কুমার দাস

আমরা যদি পৃথিবীর ক্রমান্বয়ে সভ্যতার ইতিহাসের (History of Civilization) ছবিটা মনে করি, তাহলে দেখতে পাবো যে পৃথিবীতে জলের উৎসের আশে পাশেই মনুষ্য জাতির বসতি গড়ে উঠেছে এবং বিকাশের সাথে সাথে জনবসতি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। জল প্রকৃতির সব চেয়ে অমূল্য সম্পদ। জল ব্যতীত কোন living organism বাঁচতে পারে না। জলের প্রয়োজনীয়তা বহুমুখী এবং সুদুরপ্রসারী যা মানব জাতির বিকাশের সাথে সাথে উত্তরোত্তর বাড়ছে। আমরা জানি যে, পৃথিবীর তিন ভাগ জল এবং একভাগ স্থল। এই তিন ভাগ জলের ৯৫% সামুদ্রিক জল যা অতিরিক্ত লবণাক্ত এবং পানের ও গৃহস্থালির কাজের অনুপযুক্ত। জলের বাকী অংশের ৪% উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে বরফ হয়ে জমে আছে। আর অবশিষ্ট ১% জলকে নদী, নালা, জলাশয়, খাল এবং ভূগর্ভস্থ জল হিসাবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই ১% জলকেই 'fresh water" হিসাবে গণ্য করা হয়। যা পানীয় জল

ও গৃহস্থালীর কাজে, কৃষিকাজে, এবং নানাবিধ অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর মোট জলের এই ক্ষুদ্র অংশের ১% র গুরুত্বও তাই আমাদের কাছে অনেক বেশী। এই অংশটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একান্ত দরকার আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, সচেতনতা, ব্যবহারিক দূরদৃষ্টি ও সাবধানতা যাতে প্রকৃতির এই অমূল্য দানটি কলুষিত/দুষিত ও অযথা অপচয় না হয়।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে (১) বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের উত্তরোত্তর বিকাশের ফলে, (২) খনিজ পদার্থের অন্বেষণ এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে মাটির নীচে থেকে খনিজ পদার্থগুলোর উত্তোলনের ফলে, (৩) শহর ও শহরতলীর সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোর উন্নতির সাথে সাথে, (৪) বিক্ষিপ্ত ও অবৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন ক্ষতিকারী এবং বিষাক্ত রাসায়নিক কারখানা স্থাপন ও তাদের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের গাফিলতিতে, (৫) প্রশাসনের অদক্ষ লোকের অদূরদর্শীতা, (৬) চাষের কাজে ব্যবহৃত অত্যাধিক রাসায়নিক সার, (৭) বিভিন্ন insecticides, pesticides, herbicides-র অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার ও অপচয়, (৮) সীমাহীনভাবে ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলন, ব্যবহার ও অপচয়, (৯) ছোট ও বড় শিল্পের কারখানা থেকে নির্গত অপরিশ্রুত বিষাক্ত ধাতু সমন্বিত বর্জ্য পদার্থ (industrial effluent) খোলা মাঠে, নদীতে, পুকুরে ও জলাজমিতে ফেলা, (১০) বিভিন্ন পৌরসভা ও পঞ্চায়েত সমিতির ঢিলেমি নজরদারি এবং আরও প্রভূত দৈনন্দিন কাজের দূরদর্শিতার অভাবে, প্রকৃতির এই অমূল্য দানটি ধীরে ধীরে কিন্তু গভীরভাবে দূষিত হয়ে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে।

এই পরিবেশ দূষণ কেবলমাত্র মনুষ্য জাতির দ্বারা সৃষ্ট হয় না। বহুবিধ প্রাকৃতিক কারণও নানান রকম দূষণের জন্য দায়ী যার ভুরিভুরি উদাহরণ আমরা সকলেই জানি। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে প্রাকৃতিক (natural) এবং অপ্রাকৃতিক (authropogenic) অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের এই সুন্দর পরিবেশকে নানাবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা দূষিত করে এই পৃথিবীকে মনুষ্য জাতির সুস্থভাবে বসবাস ও জীবনধারণের জন্য অনুপযুক্ত করছে এবং মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছে।

এইসব কারণেই প্রাথমিক প্রয়োজন বিশুদ্ধ জলের উৎসের চরিত্রের (প্রধানতঃ ভৌত ও রাসায়নিক) গুণগত পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয়, পর্যালোচনা এবং সর্বোপরি সঠিকভাবে নজরদারির। তবেই আমরা জানতে পারবো নির্দিষ্ট দূষণের মাত্রা, তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিভিন্ন উপায়।

প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদটি তিনটি নির্দিষ্ট অবস্থাতে থাকে : কঠিন (বরফ ও স্নো হিসাবে antarctic, arctic এবং পর্বত অঞ্চলে), তরল (সাগর, সমুদ্র ও inland water) এবং গ্যাস (atmosphere-এ অদৃশ্য অবস্থায় জলীয় বাষ্প হিসাবে)।

জলের চরিত্র নিম্নদিকে প্রবাহিত হওয়া। এর ফলে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রবাহিত হওয়ার সময় বিভিন্ন প্রকার মৌলধাতুর যৌগিক পদার্থগুলি জলে দ্রবীভূত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে এই পদার্থগুলির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এই দ্রবীভূত যৌগিক পদার্থগুলির পরিমাণ, তাদের রাসায়নিক চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন হয় এবং তা নির্ভর করে জলের প্রবাহমান অঞ্চলের geological, geographical ও environmental set up-এর উপর।

জলের মান নির্ণয় করা হয়, জলে দ্রবীভূত অবস্থায় কতটা পরিমাণ প্রত্যেকটি যৌগিক পদার্থের উপস্থিতি আছে। প্রত্যেক যৌগিক পদার্থের cation (ধনাত্মক আয়ন) ও anion (ঋণাত্মক আয়ন) বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদ্ধতির দ্বারা সঠিকভাবে quantify করা হয়। সাধারণত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও আয়রণ cation হিসাবে এবং বাইকার্বোনেট, সালফেট, ক্লোরাইড, নাইট্রেট, নাইট্রাইট, ফসফেট, ফ্লোরাইড anion হিসাবে মাপা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন toxic এবং non-toxic মৌলধাতু যেমন অ্যালুমিনিয়াম, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, মারকারি, বেরিয়াম, কপার, লেড, জিঙ্ক, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদির পরিমাণ নির্ণয় করার পর, জলের গুণগত অবস্থার বিশ্লেষণ করে, তার চরিত্র নির্ধারণ করা হয়। এই চরিত্র থেকেই সেই জল কতটা বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পান করা ও গৃহস্থালির কাজ কর্মে ব্যবহার করা যায় কিনা তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঠিক করা হয়। প্রতিটি মৌলিক পদার্থের দ্রবীভূত অবস্থার পরিমাণ অনুযায়ী জলের বিশুদ্ধতা বা দূষণের মাত্রা ও চরিত্র চিহ্নিত করা হয়। জলে প্রায় প্রতিটি naturally occuring element নানান মাত্রায় (nanogram থেকে percentage amount) দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। তবে কোন মৌল পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় কতটা থাকবে কি থাকবে না, সেটা সেই জলের উৎস এবং তার গতিপথের geographic, geological এবং environmental condition-এর উপর নির্ভর করে। কোন একটি বা একাধিক মৌলিক পদার্থ যদি মনুষ্যদেহের সহনশীলতা মাত্রার (tolerance limit) বেশী পরিমাণে থাকে তাহলে সেই জলকে দূষিত বলা হয় এবং মানুষের পানের ও গৃহস্থালির কাজের অযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। প্রতিটি মৌল পদার্থের জলে অতিরিক্ত পরিমাণের উপস্থিতি মানব দেহের উপর বিরূপ প্রভাব আছে যার শারীরিক manifestation বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে জনসাধারণ কেবলমাত্র পানীয় জলের আর্সেনিক, ফ্লোরাইড, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, মারকারির মতন মৌলের সহনশীলতার বেশী উপস্থিতি নিয়ে যতটা সোচ্চার হয়, জলে দ্রবীভূত অবস্থায় অন্যান্য common মৌল পদার্থের উপস্থিতি (যেমন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, সালফেট, নাইট্রেট, নাইট্রাইট, ক্লোরাইড, ইত্যাদি) ঠিক সেই পরিমাণে সোচ্চার হয় না। যদিও এইগুলোর জলে অধিক উপস্থিতি ও তাদের মানব শরীরে বিরূপ প্রভাব কোন অংশেই কম নয়। এই নিবন্ধে বর্তমানে বহুচর্চিত 'মৌল পদার্থ ফ্লোরাইড আয়নের' মানব শরীরে কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তার সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ফ্লোরাইড এমন একটি মৌল পদার্থ যার বেশী পরিমাণের জলে উপস্থিতি মানব শরীরে যেমন ক্ষতিকারক, ঠিক সেই ভাবেই এর সহনশীলতার কম পরিমানের উপস্থিতি বা একদম অনুপস্থিতিও মানব শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও হয়। সেইজন্য পানীয় জলের গুণগত অবস্থা সঠিক জানার জন্য অনুমোদিত পদ্ধতি দ্বারা ফ্লোরাইড-আয়ন-এর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। আগেই বলেছি যে পানীয় জলে বিভিন্ন মাত্রার ফ্লোরাইড-আয়নের উপস্থিতি মানব শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে নানাবিধ health hazard-এর কারণ হয়ে ভবিষ্যতে ভয়াবহ হয়ে ওঠে। মানব দেহের হাড়ের (bone) মুখ্য উপাদান ক্যালসিয়াম ফসফেট যৌগ দ্বারা গঠিত। মানব দেহের সহনশীলতার অধিক ফ্লোরাইড-যুক্ত জল পান করলে, জলের ফ্লোরাইড-আয়ন মানব শরীরের হাড়ের ক্যালসিয়াম ফসফেট-র প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকার ফলে, হাড়ের calcification ধীরে

হতে থাকে, ফলে দেহের হাড়ের বিভিন্নভাবে deformation হয় (সাধারণত হাতের, পায়ের ও spine-এর হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যায়), যাকে ডাক্তারিশাস্ত্রে 'fluorosis"- বলা হয়। যদি এই deformation বেশী মাত্রায় হয়ে থাকে তাকে 'crippling fluorosis" বলে। এর ফলে মানব শরীরের বিকাশ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হয় না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ভালভাবে চলতে ফিরতে পারে না এবং সাধারণ কাজকর্ম করতেও সক্ষম হয় না। তাই বহু দেশে জলের ফ্লোরাইড-আয়নের মাত্রা regulate করে safe limit-র মধ্যে সরবরাহ করে। যদিও Bureau of Indian Standards (BIS)-এর guidelines অনুযায়ী পানীয় জলে ফ্লোরাইডের মাত্রা 1mg/lt মধ্যে রাখতে বলা হয়েছে, তবুও নজরদারীর অভাবে এই বিষাক্ত মৌলটির মাত্রা, এখনও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি সমস্যাজড়িত issue হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার ফলে ঐখানকার বহু মানুষ মারাত্মকভাবে fluorosis রোগে আক্রান্ত হয়ে দিনানিপাত করছে। UNICEF-এর তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষের ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলের পানীয় জলের ফ্লোরাইড আয়নের মাত্রা অনুসন্ধান রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গেছে যে ১৯টি রাজ্যের মানুষ endemic fluorosis দ্বারা আক্রান্ত। প্রায় ৬০ মিলিয়ন মানুষ (প্রতি ১০০ জন ভারতীয়ের মধ্যে ৫-জন) মাঝারি থেকে অত্যাধিক মাত্রায় এই অসুখে ভুগছে।

ক্রমশঃ

সেবক

কলকাতা ২৯ পৌষ ১৪২১ ● বুধবার ১৪ জানুয়ারি ২০১৫

শুভেচ্ছা-২০১৫

ইংরেজিতে বলে থাকি ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’। এই বাক্য-বন্ধনের মধ্যে দিয়েই নতুন বছরকে আমরা স্মরণে-বরণে একে-অপরের শুভ কামনা করে থাকার রেওয়াজ আজ আমাদের সকলেরই নিয়মানুবর্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করতে ভালোবাসি যেন এ বছরটা সকলেরই ‘আরও কিছুটা’ ভালো কাটে। আর্থিক, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে। পরিবার-পরিজনের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে। সঙ্কল্পে অটলতা অথবা সাহসিকতার সঙ্গে নতুন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বছরব্যাপী নানান সেবামূলক ক্রিয়া-কলাপ এই পত্রিকার পাতায় পাতায় ধারাবাহিকভাবে এতদ অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস, যেমন দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন হিসেবে তুলে ধরছি, ঠিক সেভাবেই আপনার জন্যও ‘সেবক’ তার উন্মুক্ত পরিসর খোলা রাখছে নিয়মিত। আজ এই অঞ্চলের মানুষের কাছে যা অতীব কাঙ্ক্ষিত, সেই গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল প্রায় নির্মাণশেষের পর্যায়ে। খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে ‘আউট ডোর পেশেন্ট’ পরিষেবার প্রক্রিয়া। নতুন বছরের শুভারম্ভে এই বিশেষ খবরটি দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে পত্রিকা ‘সেবক’ তার সেবার ধ্বনি ‘জয় হো’ ধ্বনিত করলো।

স্মরণে

অনুকূল সরকার

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের সাথী। গত ২রা ডিসেম্বর, ২০১৪ নিজ বাসভবনে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন আমাদের প্রিয় অনুকূলবাবু। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। ফেলে আসা তিন দশক ধরে সঙ্ঘের পরিচালন সমিতির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন পরিষেবার কাজে নিজেকে নিরলস যুক্ত রেখেছিলেন। এই সঙ্ঘের চিকিৎসা বিভাগের জন্য ঔষুধ সংগ্রহ, সেবা নিবাস নির্মাণকাণ্ডে অর্থসংগ্রহ এবং নিয়মিত চক্ষু বিভাগের পরিষেবায় ঐকান্তিকভাবে যুক্ত ছিলেন। এমন নিঃস্বার্থ কর্মী ও সমাজসেবীর অভাব আমরা সর্বক্ষণ উপলব্ধি করব। জন্ম ৩রা নভেম্বর, ১৯৩৮। আদি নিবাস বাংলাদেশের কুমিল্লায়। ছাত্রজীবন কেটেছে বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে। পরবর্তীকালে পুনের মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কাশীপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ছিলেন কয়েক বছর। তারপর ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পাইতে প্রোডাকশন ম্যানেজারের পদে থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সাল থাকেই ক্যানাল স্ট্রিটের স্বগৃহের বাসিন্দা। ১৯৮৫-তেই তৎকালীন সভাপতি মাণিক্যরতন গুহঠাকুরতার সান্নিধ্যে এসে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সদস্য হন। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, এক পুত্র ও বর্তমানে আমেরিকাবাসী কন্যা-জামাতা ও নাতনিকে। তাঁর পরিবারের সদস্যেরাও সঙ্ঘের সেবা কাজে আগ্রহী। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষ থেকে তাঁদের সকলের প্রতি এই শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি রইল।

সংক্রান্তি

স্বপন চক্রবর্তী

‘মঙ্গলে উষা, বুধে পা, ১৪জানুয়ারি, সংক্রান্তিতে সাগরে যা’। পৌষের শেষ দিন। মা-ঠাকুমা-দিদিমার হাতের পায়েস, পিঠে-পুলির সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ভক্তকুলের সেই জনসমাগম গঙ্গাসাগরে ডুব দিতে। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে সংক্রান্তির দিনটিকে চিহ্নিত করা হয় উৎসবের মধ্যে দিয়ে। মূলত ফসল কাটা এবং ঘরে তোলার শুভারম্ভ এই সংক্রান্তির দিন থেকেই। গঙ্গা স্নানের মধ্যে দিয়ে সূর্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ফেলে আসা বছরের মলিন, কালিমামুক্তির জন্যই এই আরাধনা। সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা, সারা বছরের সুখ-সমৃদ্ধির। এই উৎসবকেও ‘বিস্তৃত’ করে কোনও কোনও রাজ্যে নবমী, দশমী, একাদশী এবং দ্বাদশীরূপে চারদিন ধরে পালিত হয়।

উত্তর ভারতের এই সংক্রান্তির দিনে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে হরিদ্বার, বেনারস এবং এলাহাবাদের গঙ্গায় ডুব দিয়ে নিজেকে শোধিত করা বা নিজের সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা করতে। আমাদের রাজ্যের মানুষ মূলত গঙ্গাসাগরে জমায়েত হন। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষেরা , পাঞ্জাব বা হরিয়ানায় সংক্রান্তির দিনটিকে পালন করেন ‘লহরি’ উৎসবের নামে।

গুজরাটে সংক্রান্তি ‘উত্তরায়ন’ নামে পালিত হয়। সেখানে দু’দিনব্যাপী এই উত্তরায়ন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। প্রথম দিন উত্তরায়ন হিসেবে পালিত হয়ে দ্বিতীয় দিন ‘শুকনো বা বাসি উত্তরায়ন’ নামে পালিত হয়। ওখানকার মানুষের কাছে ওই দিনটি বিশেষভাবে মাঙ্গলিক।

তামিলনাড়ুতে সংক্রান্তি পালিত হয় ‘পোঙ্গাল’ নামে। পোঙ্গাল পালিত হয় চার দিনব্যাপী। সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিনকে বলে ‘থাই পোঙ্গাল’ এই দিনটি পালিত হয় সংক্রান্তির দিনে, অর্থাৎ ১৪ জানুয়ারি। থাই পোঙ্গালের পর মাত্তু পোঙ্গাল এবং কানুম পোঙ্গাল। থাই পোঙ্গালের আগের দিনে পালিত ‘ভোগী’।

অন্ধ্রপ্রদেশেও সংক্রান্তি পালিত হয় তামিলনাড়ুর মতই চার দিনব্যাপী। মূল সংক্রান্তির আগের দিন ‘ভোগী প্যাণ্ডিগাই’ দিয়ে শুরু করে সংক্রান্তির দিনকে বলে ‘পেড্ডি প্যান্ডুগা’। পরবর্তী দু’দিন কানুমা প্যাণ্ডুগা এবং মুক্কানুমা নামে।

কেরলে সংক্রান্তি মকরাভিলাক্কু বিশাল

উৎসবের আকার নেয়। পৃথিবীর বিখ্যাত সাবরীমালা আয়াপ্পা মন্দিরে এই উৎসবে সামিল হন সকলে। হাজারো হাজারো ভক্তরা অপেক্ষা করেন মকরাভিলাক্কুর স্বর্গীয় কল্যাণময় আলোয় আলোকিত হতে। আগামী বছর সংক্রান্তি বৃহস্পতিবার, ১৪ জানুয়ারি।

পান্থজনের সখা

প্রতিভা সরকার

শিরোনাম দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক এই লেখ জীবনের কোনও দার্শনিক ব্যাখ্যা অথবা ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের আখ্যান। আসলে কিন্তু এই লেখায় তুলে ধরতে চাই জীবনের খুবই নীরস অথচ অপরিহার্য ঝঞ্ঝাটময় একটি দিক—আইনি সমস্যা, আইনের সহায়তার খোঁজ। নিকটাত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতা, সম্পত্তি নিয়ে হানাহানি, ঠগের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হওয়া, পরিশেষে আইনের দ্বারস্থ হতে চাওয়া। যাদের অর্থবল, লোকবল দুই-ই আছে তারা নিজের হকের জন্য লড়াই জারি রাখতে পারেন। কিন্তু তারা ক'জন? বিশাল এই দেশের অগুনতি গরিবগুর্বোর জীবনে যখন দেখা দেয় আইনি জটিলতা, আইনি সাহায্যের অপরিহার্য্যতা, তখন কোথায় যাবেন তাঁরা? রাষ্ট্রের কাছে কোনও ভাবে সাহায্যের হাত বাড়াবার প্রত্যাশা কি করতে পারেন না তাঁরা? পারেন। এই লেখার গভীরে যাবার আগে কয়েকটি উদাহরণ :

উদাহরণ ১: কিছুদিন আগের খবরের কাগজে প্রকাশিত প্রত্যন্ত গ্রামের একটি শিশুকন্যার পাচার হয়ে যাবার কাহিনী। পাচারকারী নিজের জামাইবাবু। রুখে দাঁড়ান মেয়েটির অতীব গরীব সৎ-মা। কিছু সহৃদয় আইনকর্মীর সহায়তায় অপরাধীকে গ্রেপ্তার করাতেও সক্ষম হন তিনি।

উদাহরণ ২: সইফুল মণ্ডল একজন নির্বিরোধী শান্তিপ্রিয় প্রান্তিক বাঙালি কৃষক। তার জমির আল কেটে বার বার জল বার করে নিচ্ছিল এক ক্ষমতাশালী প্রতিবেশী। প্রতিবাদ করতে গিয়ে সইফুল নির্মমভাবে প্রহৃত হন প্রকাশ্য দিবালোকে। অর্থের অভাবে সব দিকে মার খাওয়া এই কৃষক আদালতের সাহায্য নেবেন কিভাবে জানেন না!

বিশাল এই দেশে এ জাতীয় উদাহরণ দিতে থাকলে লেখাই শেষ করতে পারবো না। তাই আজ এটাই জানাতে চাই যে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় এই বঞ্চিত নিপীড়িত ম্লান মুখগুলিতে ভাষা যোগাবার জন্য ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে আছে স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি বা রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। এদের অন্যতম কাজ হচ্ছে সেইসব ব্যক্তিদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো, যারা বিনা খরচে আইনি সাহায্য পাবার অধিকারী। যেমন ১) মহিলা বা শিশু, ২) তফসিলি জাতি/ উপজাতি সদস্য ৩) শিল্প-শ্রমিক, ৪) হিউম্যান ট্র্যাফিকিং বা মানুষ নিয়ে অবৈধ কারবারের শিকার ৫) বেগার শ্রমিক ৬) মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী ৭) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্বিপাকের শিকার যেমন জাতিগত হিংস্রতা, জাতপাত ঘটিত বর্বরতা, শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয় ৮) জেলে অথবা সংশোধনাগারে আছেন এমন ব্যক্তি ৯) যে কোনও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষ এই স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির দ্বারস্থ হতে পারেন। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে কেস চালানোর সময় দেখা হবে সেই ব্যক্তির বার্ষিক আয় ১,২৫,০০০ টাকার কম কিনা এবং নিম্ন আদালতে মামলার ক্ষেত্রে সেই বার্ষিক আয় একলক্ষ টাকার কম হলেও তিনি বা তাঁর পরিবার বিনা আর্থব্যয়ে আইনি সাহায্য পাবার আধিকারী।

আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের ঠিকানা হচ্ছে নগর দেওয়ানি আদালত ভবন বা সিটি সিভিল কোর্ট, ২ এবং ৩ কিরণশঙ্কর রায় রোড দ্বিতল, কোল-১। এদের দূরভাষ-০৩৩-২২৪৮-৩৮২২, ফ্যাক্স-২২৪৭-৪২৩৫। অথবা যোগাযোগ করা যেতে পারে কলকাতা হাইকোর্টের সেন্টিনারি বিল্ডিং-র তৃতীয় তলে 'কলিকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় আইনি পরিষেবা সংস্থার' সঙ্গে, যাদের দূরভাস-০৩৩-২২৪৪-৮১৯৫।

রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে লোক আদালত গঠন এবং তার মাধ্যমে বাদী ও বিবাদী পক্ষের মধ্যে সমঝোতা (compromise or settlement) সূত্র আবিষ্কার করা। যা নিয়ে বিবাদ সে বিষয়টি দীর্ঘদিন হয়তো কোর্টে ঝুলে রয়েছে, ফয়সালা হয়নি। অথবা টাটকা নতুন বিষয়ও লোক আদালতের বিচারাধীন হতে পারে। নতুন করে তৈরি হয়েছে গরিব মানুষকে আইনি সাহায্য দেবার মত দক্ষ আইনজীবীদের প্যানেল। লোক আদালতের অন্যতম বিচারক হবার সুবাদে দেখেছি সত্যি এতে মানুষের উপকার হয়। দীর্ঘদিনের ফয়সালা না হওয়া মামলায় উভয়পক্ষ সম্মানজনক সূত্র পেলেই তা দ্রুততার সঙ্গে লুফেও নেয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইনি অধিকার সম্পর্কে প্রকাশ করেছে তথ্য সমৃদ্ধ অনেক পুস্তিকা। যেমন ঝকঝকে তাদের চেহারা, তেমনি চিত্তাকর্ষক তাদের বিষয়বস্তু। এছাড়া নিয়মিত হয়ে চলেছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বক্তৃতাবলী, সিনেমা-শো, এমনকি নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা। এগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন ভারতের প্রথম সারির বিচারপতিদের পাশাপাশি আইনজ্ঞরাও। এরপরও ভীষণ প্রয়োজন সাধারণ মানুষের প্রাথমিক আইনি সচেতনতা ও উৎসাহ বৃদ্ধির। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের মত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার কারণে যেসব পীড়িতরা এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা আসেন, এই লেখায় যদি সেই সব মানুষরা কোনও বিশেষ পথের দিশা পান, যদি মনে হয় ওই পথের দুর্গম চড়াই উৎরাই-এর কোন বাঁকে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে আছেন কোনও পান্থজনের সখা—তাহলেই এই প্রয়াস ধন্য হবে।

ভারতরত্ন

নীতিশ মুখার্জি

ভারতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ভারতরত্ন। শুরু হয় ২ জানুয়ারি ১৯৫৪ সালে। ব্যক্তিগতভাবে ব্যতিক্রমী ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের অবদানের জন্যই এই পুরস্কার। দেশের প্রধানমন্ত্রী নাম সুপারিশ করেন রাষ্ট্রপতিকে। সর্বাধিক তিনজনের নাম অনুমোদন করতে পারেন ভারতরত্নের জন্য। যদিও ১৯৯৯ সালে এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। নিয়ম ভেঙে চারজনকে ভারতরত্নে ভূষিত করা হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন এবং গোপীনাথ বরদোলুই। প্রাপকরা একটি সার্টিফিকেট এবং পীপল পাতার আকারে প্লাটিনাম খচিত মেডেল পান। কোনও রকম আর্থিক অনুদান এই পুরস্কারে দেওয়া হয় না।

প্রথম ভারতরত্নে ভূষিত হয়েছিলেন রাজনীতিক রাজা সি গোপালাচারি, নোবেল প্রাপক সায়েন্টিস্ট সি ভি রমন এবং দার্শনিক সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণান ১৯৫৪ সালে। এরপর থেকে ৪৩ জন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত মানুষ ভূষিত হয়েছেন ভারতরত্নে। এঁদের মধ্যে ১১ জন মরণোত্তর কালে। ১৯৫৫ সাল থেকেই মরণোত্তরেও এই সম্মানে ভূষিত করার প্রথা চালু হয়।

প্রথম মরণোত্তর ভারতরত্নে ভূষিত হন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। এযাবৎ কালে সর্বকনিষ্ঠ ভারতরত্নে ভূষিত হয়েছেন ক্রিকেটার সচিন তেণ্ডুলকার। মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে। শুধু ভারতের নাগরিকদের ক্ষেত্রেই ভারতরত্ন থেমে থাকে নি। সর্বজনীন বলে বিবেচিত নিয়মেই মাদার টেরিজা ভারতরত্ন পেয়েছিলেন ১৯৮০ সালে। পেয়েছিলেন পাকিস্তানের খান আব্দুল গফফর খান ১৯৮৭ এবং ১৯৯০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যাণ্ডেলা। এবার ঘোষণা হল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং মরণোত্তর স্বাধীনতা সংগ্রামী মদনমোহন মালব্যর নাম।

দেশের এই সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান, কিছু আইনি জটিলতার প্রেক্ষিতে, জুলাই ১৯৭৭ থেকে জানুয়ারি ১৯৮০ পর্যন্ত সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এরপর ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত আবারও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে মরণোত্তর পুরস্কারে ভূষিত করার পর ভারতরত্ন স্থগিত রাখা হয়েছিল কিছু প্রতিবাদের ভিত্তিতে। অভিযোগ ছিল নেতাজির মৃত্যু নিয়েই। সংশয় আজও অব্যাহত। ওই সময় নেতাজির পরিবারের লোকজনও সেই সম্মান গ্রহণ করতে অনাগ্রহী হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্ন ঘোষিত হওয়ার পরও তা বন্ধ করে দিতে হয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ১৯৯৭ সালে।

ভারতরত্ন পদকটি ছিল প্রথমে একটি গোলাকার ৩৫ মিমি ব্যাসার্ধের সোনার। মাঝে বিচ্ছুরিত সূর্যের আকারে সামনের দিকটি। ভারতরত্ন লেখাটি দেবনাগরিতে। পিছন দিকে ভারতবর্ষের প্রতীকের নীচে দেবনাগরীতে 'সত্যমেব জয়তে' লেখা প্লাটিনাম দিয়ে। বছর খানেক পরেই ডিজাইনে পরিবর্তন আনা হয়। অন্যান্য লেখাকে অপরিবর্তিত রেখেই একটি পীপল পাতার আকারে প্লাটিনাম দিয়ে তৈরি হয় পদকটি, যা এখনও চলছে। ১৯৫৪ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত এই সম্মান শুধুমাত্র শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং জনসেবাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২০১১ সাল থেকে নিয়ম পরিবর্তন করে ঘোষণা হয় যেকোনও ধরণের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানবকল্যাণে নিরলস যুক্ত থাকা ব্যক্তিকেই এই পদক দেওয়া যাবে।

ভারতরত্ন দেওয়ার ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি নেই। দেশের প্রধানমন্ত্রী বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠান সর্বোচ্চ তিনজনের নাম। সংবিধানের ১৮(১) ধারা মোতাবেক একটি সনদ ও একটি প্লাটিনাম খচিত পদক দেওয়াই রীতি। কোনও রকম আর্থিক অনুদান থাকে না। প্রাপকরা কখনও নিজের নামের আগে বা পরে সম্মানসূচক ভারতরত্ন কথাটি ব্যবহার করতে পারেন না।

নৈতিক বা রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী বাদানুবাদ থেকেই থাকে। ভারতরত্নের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কারণ ভারতরত্ন দেওয়ার নামের তালিকা চলতি নিয়মানুযায়ী প্রধানমন্ত্রীই সুপারিশ করেন রাষ্ট্রপতির কাছে। অভিযোগ উঠেছিল ১৯৫৫ সালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সময়ে এবং ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর বেলায়ও। খুব সাম্প্রতিক মতান্তর ঘটেছিল সচিন তেণ্ডুলকার এবং সি এন আর রাও-কে ঘিরেও। অনেকের দাবি ছিল, হোমি ভাবা, বিক্রম সারাভাই প্রমুখ বিজ্ঞানীরা নয় কেন? যাঁরা রাও-এর থেকেও অনেক বেশি দিয়েছেন সমাজকে। প্রশ্ন উঠেছিল, রাও-এর ১৪০০ রিসার্চ পেপার কি বাস্তবে সম্ভব? তাঁর সম্বন্ধে প্লেজিয়ারিজম-এর অভিযোগও তোলা হয়েছিল। অন্যদিকে সচিনের বেলায় তথ্য জানা অধিকারের ভিত্তিতে ইলেকশন কমিশনারের কাছে আপিল করা হয় 'মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট' লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে। যেহেতু সচিন একজন কংগ্রেসের মনোনীত সাংসদ তাই, ঐ সময় সচিনকে ভারতরত্ন দেওয়া হলে দিল্লি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং মিজোরাম ইলেকশনে তার প্রভাব পড়তে পারে। আরেকটি অভিযোগ ছিল ক্রিকেটার সচিনের আগে হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদকে কেন নয়?

তুলনায় এবারের নাম ঘোষনায় বিতর্ক প্রায় নেই-ই। ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এই সম্মান প্রদান করবেন দেশের রাষ্ট্রপতি। ভারতরত্ন প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৪৫।

মহারত্ন নবরত্ন মিনিরত্ন

১ পাতার পর

অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, (১৩) পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, (১৪) পাওয়ার ফিনান্স কর্পোরেশন, (১৫) রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগম লিমিটেড, (১৬) রুরাল ইলেকট্রিকেশন কর্পোরেশন লিমিটেড এবং (১৭) শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

বর্তমানে মহারত্ন পর্যায়ভুক্ত মোট ৭টি সংস্থা আমাদের দেশে আছে। সেগুলি হল : (১) ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড, (২) কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, (৩) গেইল (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, (৪) ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড, (৫) এন টি পি সি লিমিটেড, (৬) অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং (৭) স্টিল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

বর্তমান অবস্থায় সরকারের পক্ষে এই সমস্ত অতি উচ্চমানের লাভজনক সংস্থাগুলির জন্য মূলধনাদির বিনিয়োগ মোচন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যথাযথ হবে কি না — এটাই এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ সেক্ষেত্রে সরকার একদিকে যেমন এই ধরনের সংস্থাগুলির অংশীদার হিসেবে যে পরিমাণ লভ্যাংশ (dividend) পাওয়ার কথা তা ক্রমশ হারাবে ও অন্যদিকে এই প্রক্রিয়া লব্ধ অর্থ ভোগ জাতীয় খরচে নিঃশেষিত হবে। সরকার অবশ্য তাদের বিনিবেশ (disinvestment) পরিকল্পনার সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি খাড়া করে চলেছে। যেগুলি এইরকম :

১) এই প্রক্রিয়ায় সরকার তাদের নিজেদের শেয়ারের অংশ শতকরা ৫১ ভাগ অবধি অবশ্যই ধরে রাখবে। এবং এই 'তারা' সংস্থাগুলির পরিচালন পদ্ধতির ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও রাখবে। যার ফলে সংস্থাগুলির লভ্যাংশের পরিমাণ কিছু কম হলেও সরকারের বিনিবেশের পরেও লভ্যাংশের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন চলতেই থাকবে।

২) বিনিবেশের মাধ্যমে লব্ধ অর্থ উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার গত ৩রা নভেম্বর ২০০৫-এ ন্যাশানাল ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড নামে একটি অ্যাকাউন্ট গঠন করেছেন। যেখানে এই সকল কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলির বিনিবেশ কৃত অর্থ জমা করা হবে। এবং ওই সংগৃহীত অর্থের বাৎসরিক ৭৫ শতাংশ অর্থ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন উপযোগী কর্মপ্রকল্প। আর বাকী ২৫ শতাংশ অর্থ ব্যবহার করা হবে লাভজনক সংস্থা অথবা পুনরুজ্জীবিত হওয়া সম্ভব এমন সংস্থার মূলধনী ব্যয়ের জন্য। ২০০৮-০৯-এ সারা বিশ্বব্যপী বাজারের শিথিলতার দরুণ উল্লিখিত এই নিয়মের কিছু পরিবর্তন প্রস্তাবিত হয়। এই অবস্থায় ২০০৯-এ ভারতীয় যোজনা কমিশনের ব্যয় নির্ধারণ বিভাগ বিনিবেশ-মাধ্যমের লব্ধ অর্থ ন্যাশানাল ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড থেকে শতকরা ১০০ ভাগই ২০১২ সাল অবধি কতকগুলি বিশেষ সামাজিক প্রকল্পের মূলধনী ব্যয় খাতে ব্যবহার করবার অনুমোদন দেয়। পরে ওই সময়সীমা বাড়িয়ে ২০১৩-র মার্চ মাস অবধি করা হয়।

৩) গত ১৭ই জানুয়ারি ও ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৩-তে সরকার ন্যাশানাল ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড পুনর্গঠন অনুমোদন করে। সরকার এও স্থির করে যে ২০১৩-১৪ আর্থিক বছর থেকে বিনিবেশ প্রক্রিয়ালব্ধ অর্থ ওই ন্যাশানাল ইনভেস্টমেন্টের পাবলিক অ্যাকাউন্টে জমা থাকবে। যতক্ষণ না কোনও অনুমোদিত খাতে তা ব্যয় হয় বা পুনর্বিনিবেশ হয়। এই অনুমোদনপ্রাপ্ত খাতগুলির মধ্যে সরকারি ব্যাঙ্কগুলি বা বীমা সংস্থাগুলির পুনর্মূলধন নিয়োগ, কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার শেয়ারে বিনিয়োগ বা ভারতীয় রেল-এর মূলধনী ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়গুলিও অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে ২০১৩-১৪ সালে বিনিবেশ প্রক্রিয়ালব্ধ প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকা ভারতীয় রেল মন্ত্রকের মূলধনী খাতে ব্যয় হয়। অতএব সরকারি তথ্য অনুযায়ী এ কথা সত্য নয় যে বিনিবেশ লব্ধ অর্থ কেবল ভোগজাতীয় খাতে ব্যয়িত হয়েছিল।

৪) বিনিবেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলির শেয়ার, বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার, এই ধরনের সংস্থাগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় যা সংস্থাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা তথা লভ্যাংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই কারণে সিকিউরিটি অ্যাণ্ড এক্সচেঞ্জ (SEBI) বাধ্যতামূলক নিয়ম করে যে এই ধরনের লাভজনক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে জনগণের মুনাফা অংশ শতকরা ২৫ ভাগ অবধি করতেই হবে। যদিও সরকারের এই ব্যাখ্যা বহু বিদ্বজন স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে :

(ক) সরকার নিয়মিতভাবে এই সংস্থাগুলির থেকে লভ্যাংশ বাবদ বঞ্চিত হচ্ছে। যতই সরকার তার অংশের পরিমাণ এই জাতীয় সংস্থাগুলির থেকে তুলে নিচ্ছে ততই ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। লাভজনক সংস্থাগুলির লাভের অংশ সরকারের কাছে একটি নিয়মিত আয় ছিল যা কিনা এককালীন বিনিবেশের মাধ্যমে নেওয়া সরকারের পক্ষে বিচক্ষণতার পরিচয় নয়।

(খ) 'ন্যাশানাল ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড' নামক অ্যাকাউন্টের ধারণা যা কিনা বিনিবেশ লব্ধ অর্থ জমা ও মূলধনী ব্যয়ে ব্যবহার করার জন্য তৈরী হয়েছে, তা সৃষ্টির ৯ বছর পরেও ঠিকভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হয়নি।

বিনিবেশ লব্ধ অর্থ আজ পর্যন্ত বেশির ভাগই ব্যয় হয়েছে রাজস্ব খাতের ঘাটতি মেটাতে। সরকারি ব্যাঙ্কের বা বীমা সংস্থার পুনর্মূলধনী নিবেশ, রেলওয়ে সংস্থার মূলধনী বা অন্যান্য প্রকল্পের প্রাথমিক গঠনমূলক ব্যয়সমূহের জন্য সরকার দায়বদ্ধ। কিন্তু তার জন্য সরকারের লাভজনক সংস্থার অংশ বিনিবেশ কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

(গ) বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প যেমন — শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন যোজনা পরিষেবা ক্ষেত্রের খরচ আবৃত্তমূলক (recurring)। এই ধরনের খরচকে নিবৃত্ত করার জন্য অবশ্যই দরকার এক আবৃত্তজনক আয় ব্যবস্থা। কিন্তু সরকার বিনিবেশ লব্ধ অর্থ দিয়ে যে তাকে পরিপোষণ করার চেষ্টা করছে তা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ বিনিবেশ এমন একটি পদ্ধতি যাতে এককালীন অর্থ আসে। এই কারণে সরকারের এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয় এবং আশঙ্কা থেকেই যায় সরকার তার নিজস্ব সংস্থাগুলিতে তার অধিকার ৫১% অবধি ধরে রাখবে কিনা।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার সাথে তার পরিচালন পদ্ধতির উন্নতি তথা সার্বিক উন্নতির যোগাযোগ সর্বোপরি প্রযোজ্য নয়। সংস্থার উন্নতি অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। শেয়ার বাজারের দামের ওঠা-নামা অন্য অনেক পরোক্ষ প্রভাব নিত্যই পরিলক্ষিত হয় না অনেক সময় সংস্থার অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই জন্য শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তকরণ এবং তার সাথে সংস্থার যোগ্যতা অর্জনের রীতিটি সমর্থন করা যায় না। আবার শতকরা ২৫ অংশ অবধি মূলধন জনসাধারণের কাছে বিনিবেশ করতেই হবে তাও গ্রহণযোগ্য নয়।

এই আলোচনা ও বিতর্ক চলতেই থাকবে।

গান্ধী সেবা সংঘের ওয়েবসাইট

অবন সাহা

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে যে কোনো ধরণের প্রতিষ্ঠানের 'ওয়েবসাইট'-এর প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। বিগত কিছুকাল যাবৎ আমাদের এই গান্ধী সেবা সংঘের একটি ওয়েবসাইটের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল। প্রায় ৩বছর আগে গান্ধী সেবা সংঘের নামে একটি BLOG শ্রী সোহমআঢ্যের উৎসাহে খোলা হয়েছিল। কিন্তু ওয়েবসাইটের প্রয়োজনীয়তা তাতে মিটছিল না। অবশেষে সমস্ত প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত ১২ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দ-এর শুভ জন্মদিনে গান্ধী সেবাসংঘ ওয়েবসাইটটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হল আমাদের ওয়েবসাইট– www.gandhisevasangha.org.

পাঠকবর্গের প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন সুযোগমত ওয়েবসাইটটি খুলে দেখেন। এখানে গান্ধীসেবা সংঘের ইতিহাস, বর্তমান ও নতুন কর্মসূচীর বিবরণ পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটটিতে থাকছে একটি photo gallery। আমাদের সেবাসদন হাসপাতালটির বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে এখানে। দেশ বিদেশের মানুষ এর মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারবেন। অদূর ভবিষ্যতে ওয়েবসাইটটিকে আরও উন্নত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ওয়েবসাইটটির নির্মাণভার দেওয়া হয়েছিল SYSNET নামক সংস্থাটিকে। সংস্থাটি বাজার মূল্যের তুলনায় অনেক কম পারিশ্রমিকে এটি তৈরী করে দিয়েছেন। গান্ধী সেবা সংঘ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি প্রদান করে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন সম্পাদক শ্রী গৌতম সাহা ও কার্যকরী সভাপতি শ্রী হিরন্ময় সাহা। আমরা আশা করব, এই ওয়েবসাইটটি আমাদের গান্ধী সেবা সংঘকে পৌঁছে দেবে সে সকল শুভানুধ্যায়ী মানুষের কাছে যাঁরা হয়ত নিছক দূরত্বের কারণে এতদিন এই সৃজনমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারেন নি । প্রত্যাশা থাকবে এই ওয়েবসাইটটি বিশ্বের দরবারে গান্ধী সেবা সংঘকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠবে এবং এই সেবা সংঘকে বহুগুণে বিস্তৃত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

প্রশান্ত কুমার সাহা

সেবক প্রতিবেদন: চাকরি করতেন Standard Chartered Bank-এ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উপলব্ধি করেছিলেন মানুষের সেবায় নিজেকে ব্রত রাখার মধ্যে দিয়ে আসল শান্তির কথা। ভাবনায় ছিল হোমিওপ্যাথির দোকান খুলে এতদ অঞ্চলের মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। দোকান খুললেন এবং নাম দিলেন 'পাঞ্চালী'। পাঞ্চালী আজ হোমিওপ্যাথি এবং বায়োকেমিক অথরাইজড ডিলার। ধীরে ধীরে এতদ অঞ্চলের সকল মানুষের কাছে একটি বিশ্বস্ত হোমিও ওষুধের দোকানের নাম হয়ে দাঁড়ালো 'পাঞ্চালী'।

প্রশান্তবাবু জানান, এখানে হোমিওপ্যাথির যাবতীয় ওষুধ আসে মূলত Hahnemann Publishing Co. এবং Mahesh Laboratory থেকে। এছাড়াও পাঞ্চালী স্টক রাখে Schwabe India, Schwabe Germany, Rechweg Germany এবং SBL-এর।

Panchali

প্রশান্তবাবু আজ নিরলস মানসিক শান্তির খোঁজে গরিব, অপারগ রোগীদের বিনা পয়সায় যথাসম্ভব ওষুধ দিতেও কার্পণ্য দেখান না। দোকানের সকল কর্মচারীদের চিকিৎসা-খরচেও সাহায্য করতে দ্বিধা করেন না। ইচ্ছে আছে, আরও বৃহৎ আকারে হোমিও পরিষেবা দিয়ে প্রচুর মানুষের পাশে 'পাঞ্চালী'কে একটি সার্থক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার।

বিশেষ ক্রোড়পত্র

ক্যান্সার ঃ রম্যাণী বীক্ষে–বাস্তবের মাটিতে

অসীম চ্যাটার্জী

"দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগর
লহো যতো লৌহ, লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা।"

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকৃতির শান্ত- সুনিবিড় বনানীর স্নেহের ছত্রছায়ায় মানব সভ্যতা ক্রমশ বিকশিত হল। অরণ্য মানুষকে দিয়েছিল খাদ্য, সুবাতাস এবং বেঁচে থাকার জন্যে নিরাপদ আশ্রয়। কালক্রমে মানুষ যত উন্নততর হতে থাকল তত এগিয়ে চলতে থাকল নিজেদেরই বিনাশের দিকে। নগরায়ণের ফলে গাছ কেটে পরিবেশকে মরুভূমিতে পরিণত করল–যার অর্থ হল আত্মহনন। দুঃখের বিষয় হল আমরা ক্রমাগত সেই আত্মহননের পথকেই বেছে নিয়েছি। ক্রমাগত গাছ কেটে ফেলার ফলে দূষন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। যানবাহনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার আমাদের জীবনধারণের ভিন্নতা, ট্যোবাকো বা তামাক জাতীয় দ্রব্যের যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের পরিবেশকে ক্রমাগত দূষিত করে চলেছে। ফলে দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন ধরণের দুরারোগ্য ব্যাধি। তার একটা হল ক্যান্সার রোগ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ক্যান্সার হল অনেকগুলি রোগের একটা সমষ্টি যার ফলে আমাদের দেহের কোষ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তার বেড়ে ওঠার ক্ষমতাকে। এই ক্যান্সার কোষগুলি নিকটবর্তী সাধারণ কোষগুলিকেও আক্রমণ করে এবং কিছু সময় পরে এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে রক্ত বা লিম্ফনোডের মাধ্যমে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যাকে বলা হয় 'মেটাস্টেসিস'।

আমাদের শরীর তৈরি হয় কোটি কোটি জীবন্ত কোষ দিয়ে। এরা বড় হয় এবং নতুন কোষের সৃষ্টি করে একটা সুস্পষ্ট পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে। আমাদের জীবনের প্রথম দিকে কোষের বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়। ফলে আমরা দ্রুত বড় হতে থাকি। যখন আমরা পূর্ণবয়স্ক হই তখন কোন ক্ষতিগ্রস্ত কোষকে নেবার জন্যে বা মৃতকোষের জায়গা পূর্ণ করার জন্যে কোষের বৃদ্ধি হয়। ক্যান্সার তখনই হয় যখন কোষ আর তার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। নিকটবর্তী সমস্ত টিসুকেই আক্রান্ত করে এবং ক্যান্সার সেল-এ পরিণত করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা WHO (World Health Organisation) এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি ক্রমাগত আমাদের সাবধান বাণী দিচ্ছে যে ক্যান্সার রোগটি মহামারী রূপে দেখা দেবে ২০২০ সালের মধ্যে। রোগটি হানা দেবে প্রতিটি বাড়ীতে। উপমহাদেশীয় দেশ মূলত চীন, ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে এই রোগটি ব্যাপকভাবে দেখা দেবে। বিভিন্ন অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে ২০১২তে পুরো পৃথিবী জুড়ে প্রায় ১৪.১ মিলিয়ন মানুষ নতুন করে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং তার মধ্যে ৮.২ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এই মারন রোগের প্রকোপে। আমরা যদি দেখি তাহলে বুঝতে পারব অন্যান্য রোগের থেকে ক্যান্সার রোগটি একেবারেই আলাদা। ক্যান্সার রোগটি বিভিন্ন প্রকারের হয়। এটি নির্ভর করে মূলত ক্যান্সার কোষগুলি মূলত কোন অঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছে তার উপর। পুরুষ মানুষেরা প্রধানত ফুসফুস, প্রস্টেট এবং স্টোমাক ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। অপরদিকে মহিলারা প্রধানত ব্রেষ্ট, কোলোরেক্টাল, ফুসফুস এবং সারভিক্স এর ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। ২০১২ সালে দেখা গেছে ১,৬৫,০০০ শিশু যাদের বয়স ১৫বছরের নিচে তারা ক্যান্সার নামক এই ভয়ানক রোগের শিকার হয়েছে। রোগটি ক্রমাগত মহামারী রূপে দেখা যাচ্ছে তার কারণ হল অনেক। যেমন ব্যাপক তামাক জাতীয় দ্রব্যের সেবন। যারা তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবন করে তাদের মধ্যে ২২% মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে। উন্নততর দেশগুলিতে দেখা যাচ্ছে ২০% মানুষের ক্যান্সার হচ্ছে মূলত হেপাটাইটিস বি, সি এবং Papiloma Virus দ্বারা আক্রান্ত হয়ে।

বিভিন্ন গবেষনা থেকে দেখা গেছে ৯০-৯৫% ক্যান্সার হচ্ছে মূলত আবহাওয়া দুষিত হওয়ার ফলে। আমাদের বিভিন্ন ধরণের জীবন ধারণ, খাবারে যথেষ্ট পরিমাণ রংয়ের ব্যবহার, কীটনাশক ওষধের ব্যবহার ক্যান্সার রোগটির মহামারী রূপে দেখা দিতে সাহায্য করছে। আজকার বিভিন্ন ধরণের ঔষধের যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কিডনি। ফলে বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগের সৃষ্টি হচ্ছে।

আমাদের সামনে এখন মূল লক্ষ্য হল ক্যান্সার রোগটির সঠিক চিকিৎসা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত বছরের নিরন্তর গবেষনার পরেও সেই Magic Bullet টি এখনো বেরোয় নি যেটা ক্যান্সার রোগটিকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলবে। আমরা জানি ক্যান্সার রোগটি হলে তার মুলত তিনপ্রকার চিকিৎসা আছে ১) সার্জারি ২) রেডিওথেরাপি ৩) ক্যামোথেরাপি। মুশকিল হচ্ছে বেশ কিছু ধরণের ক্যান্সার কেমো এবং রেডিও থেরাপি প্রতিরোধক হয় ফলে সেই সব ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসাই করা যায় না। ফলে অর্থবল এবং লোকবল থাকলেও একটা বিরাট সংখ্যক ক্যান্সারে আক্রান্ত রুগী বিনা চিকিৎসায় মারা যায় আবার অন্যদিকে দেখা যায় আমাদের দেশ যেহেতু গরীব দেশ সেই হেতু ৮০% এর উপর ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত রোগী ক্যান্সার এর চিকিৎসা করাতে পারে না । কারণ ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা অনেক ব্যয়বহুল। ফলে আমরা বলতেই পারি বহুলাংশ ক্যান্সার রুগীই ক্যান্সার চিকিৎসার পরিকাঠামোর বাইরে থাকছে। ক্যান্সার রোগটির চিকিৎসা এসেছে মূলতঃ উন্নততর দেশ থেকে। তাদের দেশে যেভাবে ক্যান্সারের চিকিৎসা হয় তা আমাদের মত গরীব দেশে কখনই সম্ভব নয়।

এর ফলে আমাদের প্রথাগত চিকিৎসার সাথে সাথে কিছু বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। আমরা যদি এখন থেকে সাবধান না হই তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের বিপদটাকে খুব দ্রুত টেনে আনবো। কিন্তু এই বিকল্প ব্যবস্থাটা কি হবে তা আমাদের জানতে হবে। এই বিকল্প ব্যবস্থাটা কি তা কিন্তু আমাদের প্রাচীন মুনি-ঋষিরা বহু আগেই বলে গেছেন, আগামী কোন সংখ্যায় এই নিয়ে আলোচনা করব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদের অনুদান আমাদের সমৃদ্ধ করেছে গান্ধী সেবাসদন হাসপাতাল গড়ে তুলতে

১) শ্রীভূমি শারদোৎসব কমিটি ১,০০,০০০ টাকা
২) শ্রীযুক্ত এস. কে, নিয়োগী ১,০০,০০০ টাকা
৩) শ্রীমতি মঞ্জরী মিত্র ১,০০,০০০ টাকা

যাদের অনুদান ও সুব্যবস্থাদিতে গান্ধী সেবা নিবাস পরিবর্ধিত হয়েছে

১) শ্রী প্রবীর কুণ্ডু ১,৭৫,০০০ টাকা ২) শ্রীমতি মঞ্জরী মিত্র ১,০০,০০০ টাকা
৩) যোশী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ২৫,০০০ টাকা ৪) শ্রীমতি মঞ্জু মুখার্জী ২৫,০০০ টাকা
৫) শ্রী প্রণব দত্ত ২৫,০০০ টাকা ৬) শ্রীমতি মঞ্জু সরকার ৫,০০০ টাকা
৭) শ্রীযুক্ত পৃথ্বিপতি চক্রবর্তী, ৮) শ্রীমতি মঞ্জু সিন্হা, ৯) শ্রী বিমলেন্দু হালদার
১০) শ্রীমতি পদ্মা সাহা, ১১) শ্রী এন্ রামচন্দ্রন (চেন্নাই)

আনন্দের সঙ্গে জানাই যে 'গান্ধী সেবা সংঘের বহুদিনের প্রতীক্ষিত নিজস্ব ওয়েব সাইট www.gandhisevasangha.org আরম্ভ হয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই শ্রী অবন সাহাকে। এটি তৈরী করতে যিনি আর্থিক ও প্রযুক্তিগতভাবে সংঘকে সাহায্য করেছেন। আশাকরি এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গান্ধীসেবা সংঘের খবর সুদূর প্রসারী হবে।

(গান্ধী সেবা সংঘের মুখপত্র)
ডঃ হিরন্ময় সাহা - ২,০০০ টাকা
শ্রী শঙ্কর ঘোষাল - ২,০০০ টাকা
শ্রী বাসুদেব ঘোষ - ২,০০০ টাকা

এদের সাহায্য পত্রিকা প্রকাশে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সাহায্য করেছে।

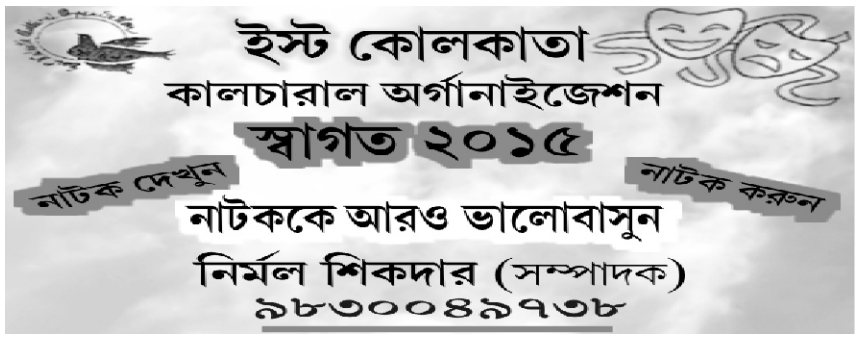

ক্যারম খেলাটা আসলে চার পকেটের শিল্প

প্রতাপ শাহু

দীপা দত্তঃ বাংলায় ক্যারম আর তার প্রস্তুতকারক প্রতাপ শাহু আজ সর্বার্থেই সমার্থক শব্দ। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় আজ থেকে প্রায় তিন'শ বছর আগেই ক্যারম খেলার চল ছিল। যদিও সে সময় কোনও সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই খেলা চলতো সমস্ত গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতেই। পাউডার কিংবা চক-এর গুঁড়ো দিয়ে। এরপর একজনের নাম পাওয়া যায়—গোপাল দত্ত, যিনি ভোলাবাবু নামেই বেশি পরিচিত। থাকতেন কলকাতার আমর্হাস্ট ষ্ট্রিটের কাছে। তিনি চালু করেছিলেন কোনাকুনি পকেটের। খানিকটা নিয়ম মানার মধ্যে দিয়ে। পরবর্তী সময়ে রাখাবাবু এসে গোলাকার পকেটের ধারণা চালু করেন। বোর্ডের সাইজেও পরিবর্তন আনেন। চালু হয় ৩৪/৩৬ ইঞ্চি বোর্ডের ঘুঁটি নিয়ে মর্সিন বোর্ডের প্রচলন হয়। পরবর্তীতে আধুনিক ক্যারমের প্রচলন করেন যথাক্রমে নিতাই মৌলিক, শশধর ঘোষ এবং অনন্ত পাল মহাশয় সঙ্গে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী।

এরপর, ১৯৭৩ সালে গঠিত হল বেঙ্গল ক্যারম অ্যাসোসিয়েশন। যাঁদের উদ্যোগে তৈরি হল এই অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সঈদ আবেদ আলী, ভূতনাথ মুখার্জি এবং প্রতাপ শাহু। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষ গাঙ্গুলি এবং কালুরাম গুপ্তা মহাশয়। প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ। সহ সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে ডঃ নন্দলাল সিনহা, শশধর ঘোষ, কান্তিক বোস, ডি কে দাশ, চন্দ্রনাথ মিশ্র। প্রথম সচিব ছিলেন সন্তোষ গাঙ্গুলী, সহ-সচিব শৈলেন ব্যানার্জি। কোষাধ্যক্ষ বাঙ্কালাল পারমার। সে সময় রেজিস্টার্ড অফিস ছিল ৩৪/এ ধর্মতলা স্ট্রিটে। আর এখন, বেঙ্গল ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সচিব প্রতাপ শাহু-এর নেতৃত্বে স্থায়ী অফিস চলছে তাঁরই বাড়ির এক তলায়, ২৬ পূর্বাচল স্কুল রোড, কলকাতা-৭৮-এ।

প্রতি বছরই এই বেঙ্গল ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বছরের শেষ থেকে এক মাসব্যাপী সারা বাংলা ক্যারম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । সিঙ্গলস এবং ডাবলসে।

হাজারে হাজারে ক্যারমপ্রেমী অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্গত প্রায় ৫০০-রও বেশি ক্লাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের পরে পরেই শুরু হয়ে যায় এক একটি ক্লাবের উদ্যোগে টুর্নামেন্ট। ২০০২-০৩ সাল থেকে মহিলাদেরও ক্যারম প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় রাজ্য ক্যারম সংস্থার উদ্যোগে। প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন মহুয়া ঘোষ, তিনি হারিয়েছিলেন কণিকা ঘোষকে। মহুয়া ঘোষ এযাবৎকালীন তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এরপর জয়া মণ্ডল দু'বার এবং পম্পা দাস একবার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। অন্যদিকে পুরুষ বিভাগে এ যাবৎ সর্বোচ্চ রাজ্য চ্যাম্পিয়নের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মহঃ ইস্তেয়াক। উনি চারবার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সিঙ্গলসে। মহঃ ইস্তেয়াক এবং আফসার হোসেনেরই ধারাবাহিক পরপর তিনবার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব আছে। ইস্তেয়াক ১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১ সালে এবং আফসার হোসেন ২০০৩, ২০০৪, এবং ২০০৫ সালে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। আরও একজন আছেন তিনবার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার তালিকায়। তিনি গৌতম প্রতিহার। এরপর আছেন সুজয় ব্যানার্জি তিনবার সিঙ্গলস এবং দুইবার ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন।

রাজ্য ক্যারম চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রথম রাজ্য চ্যাম্পিয়ন আবেদ আলী।

সুজয় ব্যানার্জী, আফসার হোসেন এবং মহুয়া ঘোষ।

সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন সঈদ আবেদ আলী, আব্দুল লতিফ, গৌতম প্রতিহার, সুজয় ব্যানার্জি, মহঃ ইস্তেয়াক, ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, আফসার হোসেন, হায়দার আলি, চিরদ্বীপ চ্যাটার্জি প্রমুখ।

এবার কিছুটা ক্যারম নিয়ে বলতেই হচ্ছে। ক্যারম অবশ্যই প্রধানত টিপের খেলা। রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে যাঁরা খেলেন, তাঁরা সাধারণের থেকে বেশখানিকটাই এই খেলার গুণগত কৌশলে এগিয়ে আছেন, তাঁদের সবারই চমৎকার টিপ। সাধারণ অ্যাঙ্গেলে দশে দশ পকেটে পাঠান। কঠিনটাও সহজ করে দেখান। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। লাগে বুদ্ধি। কঠিন পরিস্থিতি থেকে কী করে বেরোতে হবে, বড় ক্যারম-তারকারা জানেন। এই বড়রাই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মূলপর্বে লড়েন। টিপ এবং বুদ্ধির পরেও লাগে বিবেচনা, রণকৌশল, পরিকল্পনা। এবং অতি অবশ্যই নিখুঁত মানসিকতা। চাপে ভেঙে না পড়া। পিছিয়ে থাকা অবস্থাতেও মাথা ঠাণ্ডা রাখা। ক্যারম খেলায় এত কিছু আছে, অধিকাংশ মানুষই জানেন না। জানার চেষ্টাই করেন না। জানলে, আগ্রহী হতেন। বড় ক্যারম-শিল্পীদের যেমন সম্মান করতেন, অপর দিকে এই ক্যারম খেলাকে আন্তর্জাতিক মানে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্নভাবে নিশ্চয়ই সাহায্যও করতেন।

অনুল্লেখনীয়, তবুও বলতেই হচ্ছে, এমন কোনও ঘর কিংবা ক্লাব পাওয়া যাবে না যেখানে ক্যারম খেলা হয় না। বিশেষত প্রতাপ শাহু-র নিজের হাতে তৈরি ক্যারম বোর্ডে। অথচ আজও সরকারি উদ্যোগের খামতি থেকে গেছে এই খেলার প্রসারে, প্রচারে। কিন্তু, এখানেই শেষ নয়। গতির উল্টো গতিও থাকে। আশার আলো, সমাজে এমন মানুষও আছেন। যাঁরা নিজেদেরউদ্যোগে বহুল প্রচারিত না হওয়া সত্ত্বেও প্রচারের আলোতে আলোকিত করে তুলতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন এই খেলার ময়দানে। রাজ্য ক্যারম সংস্থার পূর্ণ সহযোগিতায় বহু জায়গায় ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগে একসঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটি বোর্ড নিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন হয়ে থাকে। খেলোয়াড়দের পুরস্কার স্বরূপ আর্থিক প্রাপ্তিও ঘটে। ২০১৪-১৫ সালের রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা চলছে বেলেঘাটার অগ্রবাণী ভবনে। এই লেখা প্রকাশের সময়ে এবারের চ্যাম্পিয়নশিপ প্রায় ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এবারের রাজ্য ক্যারম চ্যাম্পিয়নশিপ পুরস্কার মূল্য ৫৫ হাজার টাকা। এছাড়াও থাকে সুবিশাল ট্রফি। হায়েস্ট সেঞ্চুরির পুরস্কার। এবং জাজেস পুরস্কার। ১৯৭৫ সাল থেকে শ্রী প্রতাপ শাহু মহাশয়ের সম্পূর্ণ উদ্যোগে চালিয়ে যাচ্ছেন এই রাজ্য ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনকে। পাশে পেয়েছেন বিভিন্ন সময়ে অনেক মানুষকে। প্রধান পৃষ্টপোষক হিসেবে পেয়েছেন অশোক দাশগুপ্তকে। সভাপতি হিসেবে গীতানাথ গাঙ্গুলি মহাশয়ের মত আইনজীবীকে। পেয়েছেন অলক চৌধুরি, এ বি রক্ষিত, মুকুল দে, জাহির ইসমাইল, এস. কে. প্রামাণিক, অসীম হাজরা এবং কোষাধ্যক্ষ কাশীনাথ দত্তর মত মানুষদের। এছাড়া আছে পূর্ণ কাউন্সিল মেম্বাররা। যাঁরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও সময়ে বিখ্যাত ক্যারম খেলোয়াড় ছিলেন।

সারা পশ্চিম বাংলায় এমন কোনও ক্লাব হয় না যেখানে প্রতাপ শাহু-র তৈরি ক্যারম বোর্ডে খেলা চলছে না। এতদ সত্ত্বেও আক্ষেপ থেকেই যায়। এমন একটি ঘরে ঘরে প্রচলিত খেলার প্রতি আজও কেন সরকারি উদ্যোগের খামতি থেকেই গেল! যখন ক্যারম ছাড়া পাড়ায়-পাড়ায়, ক্লাবে ক্লাবে বিনোদন ভাবাই যায় না, তখন কেন এই খেলা অবহেলিতই রয়ে যাচ্ছে সরকারের কাছে? প্রশ্ন থেকেই যায়!

বিশেষ ক্রোড়পত্র

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১ এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও প্রিন্ট-ও-গ্রাফ, ৩ বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। সম্পাদক : জবা গুহঠাকুরতা